The Faculty Journal of Arts, Rajshahi University
Special Volume-7 on **Issues Around Pedagogy: Teaching-Learning Strategies in Arts & Humanities for the 21st Century**, **3rd International Conference**, 25-26 June 2025, ISSN 1813-0402

ফারসি ভাষায় কুরআন অনুবাদে শাহ অলিউল্লাহর গৃহীত নীতিঃ একটি পর্যালোচনা

[Shah Waliullah's Principles in Translating the Quran into Persian Language: A Review]

Md. Rabbi Sarker
Ph.D Researcher, Department of Persian Language and Literature, University of Rajshahi, Bangladesh

ARTICLE INFORMATION

The Faculty Journal of Arts
Rajshahi University
Special Volume-7
ISSN: 1813-0402 (Print)

Received : 05 February 2025
Received in revised: 15 April 2025
Accepted: 16 March 2025
Published: 25 October 2025

Keywords:
Persian Language, Shah Waliullah, Quran Translation, Principles of Translation, Analysis.

ABSTRACT

Qutbuddin Ahmad bin Abdur Rahim Faruqi who is renowned as '*Bharatguru*' and widely known in the Islamic world as Shah Waliullah Muhaddith Dehlavi. He was born in 1703 AD in Delhi, India. From his early age, he owned extraordinary intelligence. His wisdom spanned nearly all branches of knowledge including tafseer, hadith, fiqh, philosophy, history and politics. He originated the reformed movement by spreading the light of education by striking at the root of religious and social fanaticism. That is why, he is also called Muzaddid. He passed away in 1762 AD in Delhi. Shah Waliullah's vast sagacity and depth of knowledge in Arabic and Persian languages are well known although Urdu was his mother tongue. At a time when translation of the Quran was prohibited in the subcontinent, Shah Waliullah translated the entire Quran into Persian language, realizing the sincere desire of the common people to understand the Quran. His translated Quran *Fathur Rahman* is a groundbreaking step in the history of Quran practice in the subcontinent. Shah Waliullah completed this translation in 1738 AD. According to many scholars, it is the first Quran translation into Persian in this region. Based on his translation, the Quran was subsequently translated into different languages in the subcontinent. It was the most widely read and accepted translation among Persian speakers. Concise yet luminous contemporary translation, selection of Persian words appropriate to Arabic meaning, coordination with literal and interpretive translation, addition of necessary annotations with brief explanation etc. are the translation principles followed by Shah Waliullah. Also all other principles he adopted in this nearly 300 years ancient translation making it universal and acceptable to the Persian speaking common people will be analyzed in this discussed.

ভূমিকা

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি রহ.। তিনি বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী একজন মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকিহ, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং ইসলামি পুনর্জাগরণের পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন। দিল্লিতে জন্মগ্রহণকারী অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষণজন্মা এই মণীষী এমন এক সময়ে আবির্ভূত হন যখন মুসলিম সমাজ রাজনৈতিকভাবে দুর্বল, ধর্মীয় কুসংস্কারে নিমজ্জিত এবং নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার ছিল। এই সংকটকালীন মুহূর্তে তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিকতা ও সমাজ সংস্কারের সমন্বয়ে একটি সর্বজনীন চিন্তাধারার সূচনা করেন। তাঁর চিন্তা দর্শন, সমাজ সংস্কার, উম্মাহর ঐক্য বিশেষত কুরআন ও সুন্নাহর দিকে নিঃশর্ত প্রত্যাবর্তনের নিরন্তর তাগিদ পরবর্তী প্রজন্মের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে সমাজবিপ্লবী এই চিন্তানায়ক মনীষীর অবদান শুধু তাঁর সময়েই নয় বরং উত্তরকালে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনের গতি সঞ্চার করে। শাহ অলিউল্লাহ মুঘল সাম্রাজ্যের ১০জন সম্রাটের যুগ প্রত্যক্ষ করেন।[১] সে সময় উপমহাদেশে ফারসিই ছিল শাসক, আলেম-ওলামা ও শিক্ষিত শ্রেণির প্রধান ভাষা। সমকালীন আলেমগণ ফারসি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করে ইসলামি জ্ঞান বিস্তার ও সাহিত্যচর্চায় অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। এতে একদিকে যেমন আলেমদের জ্ঞানচর্চার ব্যাপকতা ও বহুমাত্রিকতা অনুধাবন করা যায় অন্যদিকে উপমহাদেশের ইতিহাসে ফারসি ভাষার অবস্থান ও পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতিও স্পষ্ট হয়। সে সময় শাহ অলিউল্লাহ আল্লাহর বাণী সহজে বুঝার জন্য কুরআন মাজিদকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করার যুগান্তকারী প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর এই উদ্যোগ ছিল উপমহাদেশে ধর্মীয় জ্ঞানকে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার এক বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কুরআন অনুবাদে গৃহীত নীতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভির সংক্ষিপ্ত জীবনী

দিল্লির মাদ্রাসা রহিমিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও *ফতওয়া আলমগীরি*-এর সম্পাদক আল্লামা আব্দুর রহিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন ভারতগুরু খ্যাত কুতুবুদ্দিন আহমাদ বিন আব্দুর রহিম ফারুকি। যিনি শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি নামে ইসলামি বিশ্বে পরিচিত। শাহ অলিউল্লাহ বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের মুজাফ্ফর নগর জেলার ফুলাত গ্রামে ১১১৪ হিজরি (১৭০৩ খ্রি., ২১শে ফেব্রুয়ারি) সনের ৪ শাওয়াল ঈদুল ফিতরের দুই দিন পর রোজ বুধবার সূর্যোদয়কালে জন্মগ্রহণ করেন।[২]

তিনি ছোটবেলা থেকেই প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন। মাত্র সাত বছর বয়সে কুরআনের হাফেয হন। তখন থেকেই সালাত, সিয়াম এবং গভীর রাতে তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত রহিমিয়া মাদ্রাসা ছিল তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বীয় পিতাই ছিলেন অন্যতম শিক্ষক। শাহ অলিউল্লাহ নিজের আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেন যে, তিনি পিতার কাছে শরহে মোল্লা জামি, বুখারি, তিরমিযি, মিশকাত, তাফসিরে বায়যাবি, তাফসিরে মাদারেকসহ উসূলে ফিকহ এবং আকাইদের গ্রন্থাবলি অধ্যয়ন করেন। স্বীয় পিতার কুরআনের দারসে বহুবার অংশগ্রহণের কারণে কুরআনের অর্থ অনুধাবন তাঁর জন্য সহজ হয়ে যায়। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৭ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে তিনি ১২ বছর যাবৎ একাকী জ্ঞান সাধনায় মগ্ন থাকেন। অতঃপর ১১৪৩ হিজরির শেষ দিকে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হন এবং ১১৪৪ হিজরিতে সেখানে পৌঁছেন।[৩]

মক্কা ও মদীনায় অবস্থানকালে অত্র অঞ্চলের প্রোথিতযশা আলেমগণের কাছ থেকে তিনি বিদ্যা অর্জন করেছেন। সেখানে ঠিক কতজন শিক্ষকের সাহচর্য পেয়েছিলেন এ সংখ্যা নিয়ে জীবনীকারকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। শাহ অলিউল্লাহর তাফসির, হাদিস, ফিকহ, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতিসহ জ্ঞানের প্রায় সকল শাখায় বিচরণ ছিল। কর্মজীবনে তিনি পিতার প্রতিষ্ঠিত রহিমিয়া মাদ্রাসায় আমৃত্যু দারস-তাদরিসে সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে, ১৪ বছর বয়সে বাবা আব্দুর রহিম তাকে বিবাহ দিয়েছিলেন কিন্তু কয়েক বছর পরেই স্ত্রী মৃত্যু বরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং এই রত্নগর্ভা দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভেই তাঁর স্বনামধন্য চার সন্তান যথাক্রমে ১. শাহ আব্দুল আজিজ (১১৫৯-১২৩৯হি./১৭৪৭-১৮২৪ খ্রি.) ২. শাহ রফিউদ্দিন (১১৬২-১২৩৩হি./১৭৫০-১৮১৮খ্রি.) ৩. শাহ আব্দুল কাদির (১১৬৭-১২৫৩হি./১৭৫৫-১৮৩৮খ্রি.) ৫. শাহ আব্দুল গণী (১১৭০-১২২৭হি./১৭৫৮-১৮১২খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

শাহ অলিউল্লাহ নিজ জীবদ্দশাই এবং তাঁর এই সন্তানগণ পরবর্তীতে ধর্ম ও সমাজের গোঁড়ামীর মূলে কুঠারাঘাত করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এরই মাঝে একদিন তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যায়। মাত্র ৬১ বছর বয়সে ১১৭৬ হিজরির ৩০ মুহাররম মোতাবেক ২২ আগস্ট ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাকে পুরনো দিল্লির 'মাহানদিয়ুন' এলাকায় পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।[৫] শাহ অলিউল্লাহর মাতৃভাষা উর্দূ হলেও আরবি ও ফারসি ভাষার লেখক হিসাবে তিনি সব্যসাচি ছিলেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থ সংখ্যা নিয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। গবেষকদের মতে, পাঠদানের পাশাপাশি তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে আরবি ভাষায় *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা* এবং ফারসি ভাষায় অনূদিত কুরআনের অনুবাদ *ফাতহুর রহমান* তাঁকে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি দান করেছে।

ফারসি ভাষায় কুরআন অনুবাদের প্রেক্ষাপট

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভি পবিত্র কুরআনের মর্মবাণী সহজবোধ্যভাবে তৎকালীন সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে *ফাতহুর রহমান ফি তরজামাতুল কুরআন* (فتح الرحمن في ترجمة القرآن) নামে পবিত্র কুরআন মাজিদকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি ১১৪৩ হিজরি মোতাবেক ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে হজ্জ সফরের উদ্দেশ্যে হারামাইনে গমন করেন এবং ১১৪৫ হিজরি মোতাবেক ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লি প্রত্যাবর্তন করেন।[৬] হজ্জ সফরে গমনের পূর্বেই তিনি সূরা বাকারাহ ও আলে ইমরানের অনুবাদ কাজ শুরু করেন। কিন্তু সফরকালীন সময়ে এ কাজে বিঘ্ন ঘটে। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কয়েক বছর পর এক ব্যক্তি তাঁর কাছে কুরআনের অনুবাদ পড়তে আসে। এতে তাঁর কুরআন অনুবাদের দৃঢ় আকাঙ্খা পুনরায় জাগ্রত হয়। তিনি প্রতিদিন সেই ব্যক্তিকে যতটুকু পড়াতেন ততটুকু অনুবাদ লিখে নিতেন। এভাবে ২০ পারা পর্যন্ত অনুবাদ সম্পন্ন হওয়ার পর সেই ব্যক্তি অন্যত্র সফরে চলে গেলে আবারও এ মহতি কাজ বন্ধ হয়ে যায়। শাহ অলিউল্লাহ আর কিছু কাজ করে এক তৃতীয়াংশ অনুবাদ তাঁর এক বন্ধুকে পরিমার্জন এবং অনুবাদের সাথে আয়াত সংযোজন করে পান্ডুলিপি প্রস্তুতের জন্য অনুরোধ করেন। ১১৫০ হিজরির ঈদুল আজহার দিন পরিমার্জন শুরু হয় এবং ১১৫১ হিজরির রামাজানের শুরুতেই পান্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে যায়। পরিমার্জনের শেষাংশে শাহ অলিউল্লাহ অবশিষ্ট অনুবাদ সমাপ্ত করেন। পরিশেষে ১১৫৬ হিজরিতে খাজা মুহাম্মাদ আমিন নামক এক ব্যক্তির আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতায় এই অনুবাদ প্রসার লাভ করে জনসাধারণের মাঝে প্রচলিত হয় এবং একাধিক কপি মুদ্রিত হয়।[৭]

ফাতহুর রহমানের বিভিন্ন সংস্করণ : পবিত্র কুরআনের এই ফারসি অনুবাদের গ্রহণযোগ্যতা ও সার্বজনীনতা এতোটাই ব্যাপক ছিল যে, পরবর্তীতে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রেস থেকে একাধিকবার মুদ্রিত হয়। উল্লেখ্য যে, খাজা মুহাম্মাদ আমিনের তত্ত্বধানে প্রকাশিত সংস্করণটি কোন প্রকাশনী থেকে মুদ্রিত হয়েছিল এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এটিই ফাতহুর রহমানের সবচেয়ে প্রাচীনতম সংস্করণ হিসাবে স্বীকৃত। শাহ অলিউল্লাহর মৃত্যুর ১২ বছর পর ১১৮৮

হিজরিতে তাঁর নিজ হাতে লেখা খসড়ার ভিত্তিতে মুহাম্মাদ আশিক ফেহেলতির অনুরোধে সফিউল্লাহ বিন শেখ ফকিরুল্লাহ ফাতহুর রহমানের অনুলিপি প্রস্তুত করেন। মুহাম্মাদ আশিক ফেহেলতি শাহ অলিউল্লাহর একজন অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। এই অমূল্য পান্ডুলিপি ভারতের বিখ্যাত খোদাবক্স লাইব্রেরি, পাটনা-তে সংরক্ষিত রয়েছে। এর সংগ্রহ নম্বর : ১১৪। এ সংস্করণটিও *ফাতহুর রহমান*-এর প্রারম্ভিক কপিগুলোর একটি বলে বিবেচিত।[৮]

একটি তথ্য মতে, ফাতহুর রহমান ১২৫৪হি./১৮৬৯খ্রি. সালে মিরাঠের হাশেমি প্রেস থেকে বেশ কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছিল। এছাড়াও ১২৯৪হি./১৮৭৭ খ্রি. সালে দিল্লির ফারুকি প্রেস থেকে শাহ আব্দুল কাদিরের উর্দু অনুবাদসহ; ১৯০২ সালে লাখনৌ থেকে, নূর মুহাম্মাদ কারখানা তিজারাত, করাচি থেকে তারিখ বিহীন; তাজ কোম্পানি, লাহোর থেকেও ১৯৮৬ সালে মুদ্রিত হয়।[৯] অপর বর্ণনা মতে, ফাতহুর রহমানের প্রাচীনতম কপিটি ১২৮৫ হিজরিতে হাশেমি ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়েছিল। পীর জেহান্দার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগারে (দারুল ইরশাদ, গোঠ পীর জেহান্দা, সিন্ধু) ফাতহুর রহমানের দু'টি কপি সংরক্ষিত আছে। এই সংস্করণগুলোর একটি ১৩০১ হিজরিতে ছাপা হয়েছিল যার লেখক ছিলেন মুহাম্মাদ জাওয়াদ ইবনে মোল্লা মুহাম্মাদ মূসা কাশ্মিরি। অপর কপিটি ১৩৪৮ হিজরিতে ছাপা হয়। মুহাম্মাদি মামিনি মুদ্রণালয় ১৩২৬ হিজরিতে ফাতহুর রহমানের একটি সংস্করণ অনুবাদ ও টীকাসহ হামাইল (ছোট আকারের বহনযোগ্য কপি) হিসেবে ছেপেছিল। আল্লামা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি (মৃ. ১৯৪৪ খ্রি.) কুরআন পাঠদানের সময় সেই হামাইল সংস্করণই সামনে রাখতেন বলে জানা যায়। পরবর্তীতে মুম্বাইয়ের কারিমী ছাপাখানা মুহাম্মাদি মামিনির অনুকরণে ১৩৫২ হিজরিতে হামাইল আকারে ছেপেছিল। উভয় হামাইল সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৬১ হলেও টীকার দিক থেকে দুই সংস্করণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। এছাড়াও এটি দিল্লি, আগ্রা, বেরেলি, কানপুর, লাক্ষ্ণৌ, মিরাঠ প্রভৃতি শহরে বহুবার *ফাতহুর রহমান* মুদ্রিত হয়েছে।[১০]

শাহ অলিউল্লাহর অনুবাদের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে অনেকেই *ফাতহুর রহমান* উর্দু ভাষায় অনুবাদ করেন। তন্মধ্যে তাঁরই সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলভি ও শাহ রফিউদ্দিন মুহাদ্দিস দেহলভি ছাড়াও নওয়াব ওয়াহিদুজ্জামান হায়দারাবাদি (মৃ. ১৩৩৮ হি.) এবং হাফেজ নাযির আহমাদ খানের নাম উল্লেখযোগ্য।[১১] ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশ বিভাজনের পূর্ব পর্যন্ত একটি কুরআন পাওয়া যেত যাতে প্রথমে আরবি আয়াত, তার নিচে শাহ অলিউল্লাহর ফারসি অনুবাদ অতঃপর তাঁর দু'পুত্র শাহ আব্দুল কাদির ও শাহ রফিউদ্দিনের অনুবাদ যুক্ত থাকত।[১২] বর্তমানে এই সংস্করণটির কোনো অস্তিত্ব নেই। *ফাতহুর রহমান*-এর বহুল পুনর্মুদ্রণ ও বিস্তৃত প্রচারের মধ্যেই এর প্রভাব, গ্রহণযোগ্যতা ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য প্রতিভাত হয়। উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের নামীদামী ছাপাখানাগুলো থেকে এ অনুবাদের ধারাবাহিক মুদ্রণ কেবল পাঠকপ্রিয়তারই প্রতিফলন নয়, বরং এর অন্তর্নিহিত ভাষাতাত্ত্বিক উৎকর্ষ, ব্যাখ্যাশৈলী এবং ভাবগম্ভীরতা দীর্ঘস্থায়ীকরণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। বিশেষভাবে হামাইল আকারে প্রকাশ ও প্রাজ্ঞ আলেমগণের পাঠদান জ্ঞানচর্চার উচ্চমঞ্চে এ অনুবাদের নির্ভরযোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান করে।

ফাতহুর রহমান অনুবাদে গৃহীত নীতি : *ফাতহুর রহমান* উপমহাদেশে ব্যতিক্রমধর্মী একটি অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষত ওলামায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদ হিসেবে এর গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। অনুবাদের যে সমস্ত নীতি *ফাতহুর রহমান*-কে সর্বসাধারণের কাছে বিশেষায়িত করেছে নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো।

১. প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় অনুবাদ : আসমানি গ্রন্থ আল-কুরআনের জ্ঞান ও বিধি-বিধান অনারবীয়দের জন্য সরাসরি অনুধাবন সহজ নয়। এ কারণে কুরআনের সর্বজনীন শিক্ষাকে বিশ্বমানবতার কাছে পৌঁছে দিতে অনুবাদ এক অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। সেজন্য যুগে যুগে মানুষের কুরআন বুঝতে চাওয়ার আন্তরিক আকুতিকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদের প্রধান শর্ত হলো মর্মবাণীকে অবিকৃত রেখে সাধারণ পাঠকের নিকট তা স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা। এই শর্ত পূরণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষার ব্যবহার। সহজবোধ্যতা কেবল ভাষার সরলতার সীমায় আবদ্ধ নয় বরং পাঠকের ধারণাগত সক্ষমতা এবং দৈনন্দিন ভাষাচর্চার সঙ্গে সাযুজ্যতা রেখে বাক্য গঠনের একটি পরিপূর্ণ কৌশল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শাহ অলিউল্লাহ দেহলভির *ফাতহুর রহমান* ফারসি ভাষায় কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত। তিনি এমন সরল অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছেন যা তৎকালীন ফারসি ভাষাভাষী সমাজের জন্য কুরআনের মূল বক্তব্য অনুধাবন সহজ করে তোলে। অনুবাদক নিজেই বলেন,

> **در این زمانه که ما در آنیم و در این اقلیم که ما ساکن آنیم نصیحت مسلمانان اقتضا می کند که ترجمه ی قرآن عظیم به زبان فارسی سلیس و روزمره ی متد اول بی تکلف فضیلت نمایی و بی تصنع عبارت آرایی به غیر تعرض قصص مناسبه و به غیر ایراد توجیهات منشعبه تحریر کرده شود تا خواص و عوام همه یکسان فهم کنند و صغار و کبار به یک وضع ادراک نمایند؛ لهذا این فقیر را داعیه این امر خطیر به خاطر ریختند و خواه مخواه بر سر آن آوردند .**

'বর্তমানে যে ভূখণ্ডের পরিবেশে আমরা বসবাস করছি সেখানে মুসলমানদের কল্যাণের খাতিরে কুরআন মাজিদের অনুবাদ এমনভাবে করা প্রয়োজন যা হবে সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ফারসি ভাষায়। যাতে অলংকারপূর্ণ ও কৃত্রিম

ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা না থাকে, অপ্রাসঙ্গিক কাহিনি উপস্থাপন করা না হয় এবং নানা দিক থেকে টেনে আনা ব্যাখ্যাও বাদ দেওয়া হয়। যেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত-সাধারণ, ছোট-বড় সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। এহেন উপলব্ধি থেকেই এই অক্ষম ব্যক্তির মনে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের আকাঙ্খা জাগে এবং না চাইলেও এই দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়ে'।[১৩]

শাহ অলিউল্লাহর উপরোক্ত বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট হয় যে, তিনি কুরআনের সহজবোধ্য অনুবাদ উপস্থাপনে অটল ছিলেন। তাঁর এই অনুবাদ নীতির বাস্তব প্রতিফলন *ফাতহুর রহমান* পাঠ করলেই বোঝা যায়। উদাহরণস্বরূপ সূরা ফাতিহার ৫টি আয়াতের ফারসি অনুবাদ উল্লেখ করা হলো,

১. যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক	**ستایش خدای است پروردگار عالمها**
২. যিনি করুণাময় কৃপানিধান।	**بخشاینده مهربان**
৩. যিনি বিচার দিবসের মালিক।	**خداوند روز جزا**
৪. আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।	**تو را می پرستیم و از تو مدد می طلبیم.**
৫. আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন! [১৪]	**بنما ما را راه راست**

২. আক্ষরিক ও ভাবানুবাদের সমন্বয় সাধন : আক্ষরিক ও ভাবানুবাদ পদ্ধতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আক্ষরিক অনুবাদে প্রতিটি শব্দের অনুবাদ যথাযথভাবে শব্দে শব্দে করা হয় যেখানে মূল বাক্যগঠনের রীতিনীতির প্রতি তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। অপরদিকে ভাবানুবাদে সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ অনুধাবন করে পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশের জন্য বাক্যগঠন ও শব্দচয়ন করা হয়। যদি আক্ষরিক অনুবাদে অর্থের গভীরতা ও প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায় তাহলে অনুবাদ বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। আবার ভাবানুবাদে যদি মূল ভাষাশৈলী ও শৈল্পিকতা পুরোপুরি উপেক্ষিত হয় তবে পাঠকের দৃষ্টিতে অনুবাদটি বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। সেজন্য অনুবাদে উভয়ের মাঝে সমন্বয় রক্ষায় অনুবাদকের ভাষাজ্ঞান ও বিচক্ষণতা অত্যাবশ্যক। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভি আরবি ও ফারসি ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। *ফাতহুর রহমান* অনুবাদে আক্ষরিক ও ভাবানুবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনে তাঁর আরবি ও ফারসি ভাষাজ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ সূরা নূরের ৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾

এই অনুবাদে শাহ অলিউল্লাহ লিখেছেন,

خدا نور آسمانها است و زمین. داستان نور وی در قلب مسلمانان این است مانند طاقی که در آن چراغ است. آن چراغ در شیشه است.

'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আলো। তাঁর আলো (মুসলমানদের হৃদয়ে) এমন একটি তাকের মতো যাতে একটি প্রদীপ আছে। সেই প্রদীপটি কাঁচের ভেতর।'[১৫]

এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রথম বাক্যটি আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে **در قلب مسلمانان** তথা 'মুসলমানদের হৃদয়ে' বাক্যে তিনি আয়াতের ভাবার্থ প্রকাশ করেছেন। বাক্যস্থিত এই ভাবার্থটি মূল আয়াতে সরাসরি না থাকলেও ব্যাখ্যামূলক অর্থ হিসেবে তিনি তা যুক্ত করেছেন এবং পরের বাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন যেন অর্থের মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এভাবে তিনি সমগ্র কুরআন অনুবাদে অনেক জটিল ও রূপক অর্থবোধক স্থানে আক্ষরিক ও ভাবানুবাদের সমন্বয়ে সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

৩. সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সংবলিত টীকা সংযোজন : মূল পাঠের কোনো শব্দ, বাক্য বা ধারণা পাঠকের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে বোধগম্যতা বৃদ্ধি করা এবং ভাবের গভীরতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অনুবাদকের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত টীকা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। শাহ অলিউল্লাহ পবিত্র কুরআনের বাণী এবং এর সংক্ষিপ্ত তাফসির তৎকালীন ফারসি ভাষাভাষী সকল শ্রেণি পেশার মানুষের হৃদয়ে সহজে ধারণ উপযোগী করে তোলার জন্য *ফাতহুর রহমান*-এ টীকা সংযোজন করেছেন। করাচি, পাকিস্তানের তাজ কোম্পানি লিমিটেড থেকে ছাপা একটি সংস্করণে ১০২টি সূরায় মোট ১৩০৪টি টীকা গণনায় পাওয়া যায়। এ সমস্ত টীকায় বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা, সংক্ষিপ্ত তাফসির, আয়াতের শানে নুযূল, নাসিখ-মানসূখ এবং ফিকহ সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থপূর্ণ, অপ্রয়োজনীয় বাক্য বর্জিত এবং মাধুর্যপূর্ণ ভাষায় টীকাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও টীকা বর্ণনার ক্ষেত্রে শাহ অলিউল্লাহ প্রধান যে নীতি অবলম্বন করেছেন তা হলো, আয়াতের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য এক বা দুই শব্দে বর্ণিত টীকাগুলোর ক্ষেত্রে ফারসিতে **یعنی** বা 'অর্থাৎ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আবার সম্পূর্ণ বাক্য নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা

করার ক্ষেত্রে বাক্যের শুরুতে مترجم گوید বা 'অনুবাদক বলেছেন' এবং বাক্যের শেষে আরবিতে والله أعلم বা 'আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করেছেন।

৪. আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশুদ্ধ হাদিসকে প্রাধান্য প্রদান : শাহ অলিউল্লাহ দেহলভি *ফাতহুর রহমান*-এ সংক্ষিপ্ত তাফসির যুক্ত করেছেন যাতে সাধারণ মানুষ কুরআনের বিধি-বিধান সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারে। এক্ষেত্রে তিনি জাল, যঈফ হাদিস বর্জন করে সহিহ বুখারি, সুনান তিরমিযি ও মুস্তাদারেক হাকিমে বর্ণিত বিশুদ্ধ তাফসিরের উপর নির্ভর করেছেন। *ফাতহুর রহমান*-এর ভূমিকায় বিষয়টি উল্লেখ করে শাহ অলিউল্লাহ লিখেছেন,

استمداد این کتاب در آن چه متعلق به نقل است از اصح تفاسیر محدثین که تفسیر بخاری و ترمذی و حاکم کرده و تا امکان از اخبار ضعیفه و موضوعه احتراز نموده شد ...

'এই গ্রন্থ বুখারি, তিরমিযি ও হাকিমের বর্ণিত বিশুদ্ধ তাফসিরগুলোর ওপর ভিত্তি করে সংকলন করা হয়েছে। যথাসম্ভব দুর্বল ও জাল বর্ণনা পরিহার করা হয়েছে'...।[১৬]

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সূরা নিসার ১৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর হালাল নয় যে, তোমরা জোর পূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী বনে যাও'...। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সহিহ বুখারিতে ইবনু আব্বাস রা. হতে বর্ণিত আছে, 'জাহিলী যুগে কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে স্বামীর অভিভাবকগণ সেই নারীকে উত্তরাধিকার সম্পদ মনে করত। তারা ইচ্ছা করলে নিজেরা ঐ মহিলাকে বিয়ে করত। ইচ্ছা করলে অন্যের কাছে দিত। কিংবা তাকে মৃত্যু পর্যন্ত আটকে রাখত। কারও কাছে বিয়ে দিত না। মহিলার পরিবারের চেয়ে এরা অধিক হকদার হয়ে বসত। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হলো'।[১৭]

শাহ অলিউল্লাহ অত্র আয়াত ব্যাখ্যা করার সময় সহিহ বুখারির এই হাদিসটির উপর নির্ভর করেছেন। তিনি লিখেছেন,

اهل جاهلیت زنان را نیز از جمله میراث می دانستند، ولی میت اگر می خواست به جبر در (نکاح خود) می آورد و اگر می خواست منع می کرد که با اجنبی نکاح کند تا آنکه حق تعالی این آیت فرستاد .

'জাহিলিয়াত যুগের লোকেরা নারীদেরও উত্তরাধিকার সম্পত্তির অংশ মনে করত। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী চাইলে সেই নারীকে জোরপূর্বক নিজে বিবাহ করত, আর চাইলে অন্য কারো সাথে বিবাহ করতে বাধা দিত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত নাজিল করলেন'।[১৮]

৫. ইস্রাঈলি রেওয়ায়েত ও কাহিনীগুলো ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন : মানবজাতির নৈতিক শিক্ষা, ঈমানের দৃঢ়তা, আল্লাহর আদেশ মানার পুরস্কার এবং তাঁর অবাধ্যতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণতি সম্পর্কে বাস্তবধর্মী শিক্ষা প্রদান করতে কুরআনুল কারীমে বিভিন্ন শিক্ষণীয় ও ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। শাহ অলিউল্লাহ এ সমস্ত কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। কারণ এ ঘটনাগুলোর মধ্যে অনেক ইস্রাঈলি রেওয়ায়েত রয়েছে যেগুলোর কিছু কুরআন ও হাদিস সমর্থিত এবং অধিকাংশ কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সেজন্য আয়াতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়লে তিনি সংক্ষেপে এক-দুইটি বাক্য ব্যবহার করেছেন। আবার আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনার ক্ষেত্রেও লম্বা বিবরণ বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। ইস্রাঈলি রেওয়ায়েত প্রসঙ্গে শাহ অলিউল্লাহ লিখেছেন,

قصص اسرائیلیه را که از علمای اهل کتاب منقول است نه از حدیث خیر البشر علیه و علی آله الصلوات و التسلیمات داخل کرده نشد، الا در جایی که کشف معنی به غیر ایراد آن نمی شود و الضرورات تبیح المحظورات.

'ইস্রাঈলি কাহিনী যেগুলো আহলে কিতাবের আলেমদের থেকে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু নবী করীম সা.-এর হাদিসে বর্ণিত হয়নি সেগুলো এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে ইস্রাঈলি কাহিনী ছাড়া যেখানে আয়াতের মর্ম স্পষ্ট করা সম্ভব নয় কেবল সেখানেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ **'الضرورات تبیح المحظورات'** তথা বাধ্যগত অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তু বৈধ হয়ে যায়'।[১৯]

৬. আয়াতের ছন্দের সাথে অনুবাদের ছন্দসঙ্গতি : *ফাতহুর রহমান*-এ ভাষার সৌন্দর্য, বাক্যগঠনের মাধুর্য ও কথার আকর্ষণীয় ভঙ্গিমা যথেষ্টভাবে রক্ষিত হয়েছে। শাহ অলিউল্লাহ এমনভাবে অনুবাদ করেছেন যে, একজন পাঠক যেমন কুরআন তিলাওতের সময় আয়াতের হৃদয়গ্রাহী ছন্দের আনন্দ লাভ করে। তদ্রুপ অনুবাদ পাঠেও যেন সেই একই তৃপ্তি অনুভব করতে পারে। যাতে অনুবাদ পাঠকের অন্তর ও চেতনায় গেঁথে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা শরহের ১-৪ নম্বর আয়াতে এরশাদ করেন,

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ آیا گشاده نکرده ایم برای تو سینه تو را আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে উন্মুক্ত করে দেই নি?

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ و دور کردیم از تو بار تو را আমি তোমা হতে অপসারণ করেছি সেই ভার

যা তোমার পৃষ্ঠকে অবনমিত করেছিল — الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ — آن بار كه گران كرده بود پشت تو را

এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। — وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ — و بلند ساختيم براى تو ثناى تو را

উপরোক্ত আয়াতে যেমন মনোমুগ্ধকর ছন্দ রয়েছে তেমনি صَدْرَكَ, وِزْرَكَ, ظَهْرَكَ ও ذِكْرَكَ শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি আয়াতের শেষাংশে অপূর্ব অন্ত্যমিল সৃষ্টি করেছে। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভি তাঁর অনুবাদে কুরআনের এই ছন্দ ও অন্ত্যমিল রক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন এবং সেই সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রত্যেক আয়াতের শেষে তিনি দক্ষতার সাথে تو را শব্দযুক্ত অন্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন।[২০]

৭. ফিকহি দৃষ্টিকোন থেকে অনুবাদ : শাহ অলিউল্লাহ অনুবাদের অনেক জায়গায় কুরআনের আয়াতের সুক্ষ্ম ফিকহি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন। তিনি এমনভাবে অনুবাদ করেছেন যাতে পাঠক তাৎক্ষণিক মূল বিষয়বস্তু বুঝতে পারে। যেমন সূরা বাকারার ২৪১ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ 'আর তালাকপ্রাপ্তাদের ন্যায়ানুগভাবে কিছু সম্পদ দান করবে। এটা আল্লাহভীরুদের উপর কর্তব্য'। এই আয়াতের অনুবাদে শাহ অলিউল্লাহ লিখেছেন,

و طلاق داده شدگان را لازم است بهره مند ساختن به خوش خويى (يعنى نفقه و سكنى) لازم كرده شد بر پرهيزگاران.

'আর তালাকপ্রাপ্তদের প্রতি সদাচরণ প্রদর্শন করে তাদের (ভরণপোষণ ও বাসস্থানের) ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এটা আল্লাহভীরুদের উপর কর্তব্য'।[২১]

এখানে আরবি مَتَاعٌ শব্দের অর্থ 'সম্পদ' কিন্তু শাহ অলিউল্লাহ ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ করেছেন **نفقه** 'ভরণপোষণ' এবং **سكنى** 'বাসস্থান'। এটি তাঁর অনুবাদের ভাষাগত রূপান্তরের পাশাপাশি ধর্মীয় বিধানকেও বিশ্লেষণাত্মকভাবে উপস্থাপন করার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

৮. অনুবাদে চমৎকার প্রতিশব্দ ব্যবহার : শাহ ওয়ালিউল্লাহ সমগ্র কুরআন মাজিদ অনুবাদে আরবি শব্দের যথার্থ অর্থ ও ভাব বজায় রেখে চমৎকার ফারসি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রতিটি শব্দের ব্যাকরণিক গঠন, শাব্দিক শুদ্ধতা ও প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য গভীরভাবে অনুধাবন করে অর্থপূর্ণ ফারসি শব্দ নির্বাচন করেছেন যাতে অনুবাদ অর্থবহ হওয়ার পাশাপাশি সাহিত্যিক গুণেও সমৃদ্ধ হয়। যেমন,

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ (سورة البقرة– ٢٥) — و بشارت ده آن كسان را كه ايمان آورده اند و كردند كارهائى شايسته با آن كه ايشان راست بوستانها ميرود زير آن جويها.[২২]

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ... (سورة البقرة– ٣٠) — و ياد كن چون گفت پروردگار تو به فرشتگان[২৩]

أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (سورة الطارق– ١٧) — فرو گزار ايشان را اندكى[২৪]

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (سورة العلق– ٤) — آنكه علم آموخت بدستيارئ قلم.[২৫]

উপসংহার

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভির অনুবাদে তাঁর চিন্তাধারার গভীরতা, ভাষাশৈলীর প্রাঞ্জলতা এবং প্রজ্ঞার সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অনুবাদকর্মে ব্যবহৃত ভাষার সরলতা, ভাবপ্রকাশের স্বচ্ছতা এবং ভাবানুবাদের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা একদিকে যেমন ফারসি ভাষায় তাঁর ব্যতিক্রমী দক্ষতার পরিচায় বহন করে, অন্যদিকে তাফসিরশাস্ত্রে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। এই সংক্ষিপ্ত গবেষণায় শাহ অলিউল্লাহর অনুবাদনীতি এবং তার প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁর যুগের বাস্তবতা ও প্রয়োজনকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ফলে আল-কুরআনের বাণীকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন, যা সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য এবং একইসঙ্গে জ্ঞানীদের জন্য চিন্তার খোরাকস্বরূপ। তাঁর এ অনুবাদকর্ম কেবল ভাষান্তরের দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং ইসলামি অনুবাদ সাহিত্যে একটি মৌলিক পদক্ষেপ হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

১ জুলফিকার আহমদ কিস্‌মতী, *দার্শনিক শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ দেহলভী (রহ) ও তাঁর চিন্তাধারা* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, আগস্ট ২০০০), পৃ. ১৭।

২ শাহ অলিউল্লাহ, *আনফাসুল আরেফিন* (দিল্লি: আহমাদি প্রেস, মাদ্রাসা আজিজিয়া, তা. বি), পৃ. ১৯৩-৯৪; A. D. Muztar, *Shah Waliallah A Saint-Scholar of Muslim India* (Lahore: Ripon Printing Press, 1st Edition 1979), P. 36.

[৩] শাহ অলিউল্লাহ, *আনফাসুল আরেফিন*, পৃ. ১৯৪-৯৬।

[৪] ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *শাহ্ ওলী উল্লাহ্ দিহ্লবী (র) : জীবন ও সাহিত্যকর্ম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৫ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫), পৃ. ৭৯।

[৫] A. D. Muztar, *Shah Waliallah A Saint-Scholar of Muslim India*, P. 171.

[৬] হোমা শাব্বির, *মুয়াররাফি ওয়া বাররাসি-ই অসার-এ ফারসি হযরত শাহ অলিউল্লাহ দেহলভি* (লাহোর : পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচ্যবিদ্যা অনুষদ, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৫৮।

[৭] শাহ অলিউল্লাহ, *ফাতহুর রহমান ফি তরজামাতুল কুরআন* (করাচি, সিন্ধ : প্রকাশক- শাহ ও কারখানা-ই বাজারগানি কুতুব, আরামবাগ, ফারিদ স্ট্রিট, ১২১০ হি.), ভূমিকা, পৃ. ৮

[৮] হোমা শাব্বির, *মুয়াররাফি ওয়া বাররাসি-ই অসার-এ ফারসি হযরত শাহ অলিউল্লাহ দেহলভি*, পৃ. ২৫২।

[৯] Muhammad Mosleh Uddin, *Shah Waliullah's Contribution to Hadith Literature a Critical Study* (Aligarh: Aligarh Muslim University, India, Unpublished Ph.d thesis, 2003), P. 64-65.

[১০] হোমা শাব্বির, *মুয়াররাফি ওয়া বাররাসি-ই অসার-এ ফারসি হযরত শাহ অলিউল্লাহ দেহলভি*, পৃ. ৬১।

[১১] আবু ইয়াহ্ইয়া ইমাম খান নওশহরাভি, *হিন্দুস্তান মেঁ আহলে হাদিস কি ইলমি খেদমাত* (লাহোর: মাকতাবা নাজিরিয়া, সাহিওয়াল, চিচাওয়াতানি, ১৩৯১ হি.), পৃ. ২৩।

[১২] মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি, *বার্রে সাগির কি আহলে হাদিস খুদ্দামে কুরআন* (লাহোর: তন্দিন ইসলামিক প্রেস, মাকতাবা কুদ্দুসিয়া, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৬৭৫।

[১৩] শাহ অলিউল্লাহ, *ফাতহুর রহমান ফি তরজামাতুল কুরআন*, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[১৪] *ফাতহুর রহমান ফি তরজামাতুল কুরআন* (তাজ কোম্পানী লিমিটেড, করাচি, লাহোর, ভূমিকা ও সাল তারিখবিহীন), পৃ. ৩

[১৫] *তদেব*, পৃ. ৪২৭

[১৬] শাহ অলিউল্লাহ, *ফাতহুর রহমান ফি তরজামাতুল কুরআন*, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[১৭] *সহিহ বুখারি* হাদিস নম্বর ৪৫৭৯।

[১৮] *ফাতহুর রহমান ফি তরজামাতুল কুরআন*, পৃ. ৯৯

[১৯] শাহ অলিউল্লাহ, *ফাতহুর রহমান ফি তরজামাতুল কুরআন*, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

[২০] *ফাতহুর রহমান ফি তরজামাতুল কুরআন*, পৃ. ৭২৩

[২১] *তদেব*, পৃ. ৪৯

[২২] *তদেব*, পৃ. ৭

[২৩] *তদেব*, পৃ. ৮।

[২৪] *তদেব*, পৃ. ৭১৭।

[২৫] *তদেব*, পৃ. ৭২৪।